পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহ্‌মদী

'মানবজাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।'

—হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব-পর্যায়ের ২৯শ বর্ষ : ৫ম সংখ্যা

৩১শে আষাঢ়, ১৩৮২ বাংলা : ১৫ই জুলাই, ১৯৭৫ ইং : ৫ই রজব : ১৩৯৫ হিঃ কাঃ

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫'০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ১ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

২৯শ বর্ষ
৫ম সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
০ সূরা আল-কওসার-এর সংক্ষিপ্ত তফসীর	মূলঃ হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ ও সংকলনঃ মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১
০ হাদিস শরীফ : উত্তম চরিত্র	অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৪
০ অমৃতবাণী : সাধু-সঙ্গ লাভ করার অবশ্যকতা	হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)	৫
০ জুমার খোৎবা : 'হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর সর্বোচ্চ মর্যাদা এবং চিরস্থায়ী কল্যাণ প্রবাহ'	হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ এ, কে, মুহিবুল্লাহ	৬
০ সংবাদ :		
০ হজরত সাহেবের স্বাস্থ্য		১৬
০ নাইজেরিয়ায় এক নুতন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা		

প্রকৃত রসুল-প্রেম

মোহাম্মদ (সাঃ) দুই জাহানের ইমাম এবং প্রদীপ।
মোহাম্মদ (সাঃ) যমীন ও আসমানের দীপ্তি॥
সত্যের ভয়ে তাঁহাকে খোদা বলি না।
কিন্তু খোদার কসম তাঁহার সত্বা জগদ্বাসীর জন্য খোদা-দর্শনের দর্পন স্বরূপ॥
খোদার পরে মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রেমে আমি বিভোর।
ইহা যদি কুফর হয়, খোদার কসম আমি শক্ত কাফের॥
সেই জ্যোতিতে আমি বিভোর হইয়াছি।
আমি তাঁহারই হইয়া গিয়াছি॥
যাহা কিছু তিনিই, আমি কিছুই না।
প্রকৃত মীমাংসা ইহাই॥ [দুররে সমীন]

— হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্য্যায়ের ২৯শ বর্ষ : ৪ঠা সংখ্যা :

৩২শে আষাঢ় ১৩৮২ বাং : ১৫ই জুলাই, ১৯৭৫ ইং : ১৫ই ওফা, ১৩৫৪ হিজরী শামসী

সুরা আল-কওসার

সংক্ষিপ্ত তফ্‌সীর

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৮)

[হযরত মুসলেহ মওউদ খলিফাতুল মসিহ সানী (রাঃ) প্রণীত 'তফসীরে কবীর' হইতে সংক্ষেপিত ও অনুদিত]

—মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

"ফাসাল্লে লেরব্বেকা ওয়ানহার।" অর্থাৎ, "সুতরাং তুমি (ইহার জন্য কৃতজ্ঞতা স্বরূপ) তোমার রবের (বেশী বেশী) এবাদত কর এবং তাঁহারই উদ্দেশ্যে কুরবাণী কর।"

যদি কওসারের অর্থ এখানে শুধু 'জান্নাতের নহর' করা হয়, তাহা হইলে এই অর্থের সহিত আলোচ্য আয়াতের অর্থের মিল হয় না, বরং সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যহীন হইয়া পড়ে। কেননা আল্লাহ্‌তায়ালা যখন রসুল করীম (সাঃ)-কে উহা অপেক্ষাও বড় জিনিসের (যেমন লেকায়ে-এলাহী ইত্যাদির) ওয়াদা করিয়াছেন, এবং তজ্জন্য নমায এবং কুরবাণীর কোন উল্লেখ করেন নাই, তখন তদোপেক্ষা ক্ষুদ্র জিনিসের জন্য কিরূপে উক্ত অদেশ দিতে পারিতেন? কিন্তু কওসারের অর্থ যদি সকল কল্যাণের আতিশয্য করা হয়, তাহা হইলেই এই আয়েতের সহিত উহার পূর্ণ সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কেননা কোন ব্যক্তি কল্যাণের অধিক্য সম্ভার প্রাপ্ত হইলে স্বভাবতঃ তাহার প্রতি মানুষ হিংসা পরায়ন হইয়া উঠে। সেই জন্য উহার অনিষ্ট হইতে বাঁচিবার জন্য দোয়া এবং কুরবাণীর প্রয়োজন হয়।

আলচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিতেছেন যে, যাহা কিছু তোমাকে দান করা

হইয়াছে, অথবা দান করা হইবে, উহা এত মর্যাদা ও জাঁকজমক পূর্ণ যে, মানুষে তজ্জন্য হিংসায় মাতিয়া উঠিবে। সেই জন্য এখন হইতেই দোয়ায় ব্যপৃত হও এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কুরবাণী কর। 'ফাসাল্লে লেরাব্বিকা' -এর মধ্যে ইশারা এই যে, যাঁহার নিকট প্রার্থনার জন্য তোমাকে আদেশ করা হইতেছে, তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান এবং সকলের রব হওয়া সত্ত্বেও তোমার প্রতিপালন তিনি বিশেষ ভাবে করিয়া আসিয়াছেন ; সুতরাং তুমি পূর্ণ আস্থার সহিত তাঁহার নিকট দোয়া করিতে পার।

"ইন্না শানেউকা হুয়াল আবতার"

অর্থাৎ, "সুনিশ্চিত যে, তোমার শত্রুই অপুত্রক (সাব্যস্ত) হইবে।"

আলোচ্য আয়াতে বলা হইতেছে যে, যত হিংসাই করুক না কেন তোমার শত্রুই অপুত্রক থাকিবে। যেহেতু বিরুদ্ধবাদীগণের আপত্তি ছিল যে, "হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর পুত্র সন্তান (জীবিত) নাই" সেই জন্য আয়াতের এই অর্থই হইবে যে, 'তোমার পুত্র সন্তান হইবে, তোমার শত্রুদেরই পুত্র সন্তান থাকিবে না'। ইহা স্পষ্ট যে, এখানে আধ্যাত্মিক পুত্র সন্তান সম্পর্কেই ভবিষ্য দ্বানী করা হইয়াছে। কেননা দৈহিক পুত্র সন্তান শত্রুদিগের ছিল, হযরত নবী করীম (সাঃ)-এরই পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াও বাঁচিয়া থাকে নাই। কিন্তু আধ্যাত্মিক ভাবে ব্যপার উহার বিপরিত ঘটে। কেননা শত্রুদের পুত্রগণও অবশেষে ইসলাম কবুল করিয়া লয়, ফলে তাহারা তাহাদের পিতাগণের পুত্র না থাকিয়া হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর (আধ্যাত্মিক) পুত্রে পরিণত হয়।

দ্বিতীয়তঃ কুরআন শরীফ হযরত নবী করীম (সাঃ) এর স্ত্রীগণকে মুসলমানগণের মা বলিয়া আখ্যা দিয়া নবী করীম (সাঃ)কে মুসলমানগণের পিতা বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছে। (সুরা আহ্যাব)। কিন্তু উম্মতের স্ত্রীলোকও আধ্যাত্মিক সন্তানের অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে আলোচ্য সুরার মধ্যে যেহেতু কওসার তথা একজন আগাদ কল্যাণের অধিকারী অত্যন্ত দানশীল পুত্র সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বানী ছিল, সেই জন্য আলোচ্য আয়াতে এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হইতেছে, যিনি এমন সতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী হইবেন, যাহা স্ত্রীলোকগণ লাভ করিতে পারে না। শাহাদাত এবং সিদ্দীকিয়ত ইত্যাদি মর্যাদা তো পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়েই সমানভাবে লাভ করিতে পারিত। শুধু নবুওতের মর্যাদাই এমন, যাহা স্ত্রীলোকেরা পায় না এবং পুরুষদের মধ্যেও অল্পজনেরই লাভ করার সৌভাগ্য হয়। উক্ত সুরায় যেহেতু অত্যাধিক কল্যাণের অধিকারী পুত্রের উল্লেখও রহিয়াছে, সেইজন্য এখানে নুবুওতের মোকামে অধিষ্ঠিত আধ্যাত্মিক পুত্র সম্বন্ধেই ভবিষ্যৎদ্বানী আছে বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে।

তৃতীয়তঃ সুরা আহ্যাবে "মা কানা মোহাম্মাদুন আবা আহাদেম মিররেজালেকুম

ওয়া লাকির রসুলাল্লাহে ওয়া খাতামান্নাবীয়ীন" আসিয়াছে। উক্ত আয়াতে বলা হইয়াছে যে, হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর কোন প্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র সন্তান ছিলও না, এখনও নাই এবং ভবিষ্যতেও হইবে না। পক্ষান্তরে সুরা কওসারের মধ্যে এক অত্যাধিক কল্যাণের অধিকারী দানশীল পুত্রের সুসংবাদ রহিয়াছে। সুতরাং ইহা সুস্পষ্ট যে, এখানে আধ্যাত্মিক পুত্রই বুঝান হইয়াছে। বিরুদ্ধবাদীগণ বলে যে, কওসার সম্পর্কীয় ভবিষ্যদ্বানী, নায়জুবিল্লাহ্, মিথ্যা প্রতিপন্ন হইয়াছে, কেননা হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর কোন পুত্র সন্তান নাই। তাহাদের এই আপত্তি ঔরশজাত দৈহিক সন্তানের দিক হইতে ঠিক হইতে পারে কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা বলিতেছেন যে, তাহাদের এই আপত্তি এজন্য ঠিক নয় যে, প্রথমতঃ মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্তায়ালার রসুল এবং রসুলের জন্য পুত্র সন্তান হওয়া বা না হওয়ার কোন শর্ত নাই এবং দ্বিতীয়তঃ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) শুধু রসুলই নহেন বরং তিনি "খাতামান নবীয়ীন" বা নবীগণের মোহরও। তাঁহার মোহর যে উম্মতির উপর লাগিবে সে নবী হইবে। অন্য কথায়, সে প্রচুর কল্যাণের অধিকারী দানশীল আধ্যাত্মিক পুত্র হইবে, যাহার আগমন সুরা কওসারের ভবিষ্যদ্ববানীকে বাস্তবে পূর্ণ করিয়া সত্য প্রতিপন্ন করিবে।

যদি কেহ বলে যে, নবী করীম (সাঃ) "লা নবীয়া বা'দি" বলিয়াছেন, তাহা হইলে ইহা জানা উচিত যে, তিনি (সাঃ) তো উহাও বলিয়াছেন যে, "আনা আখেরুল আম্বিয়ায়ে ওয়া মসজিদি আখেরুল মাসাজেদ"। যে ভাবে তাঁহার মসজিদের অনুকরণে আরও মসজিদ হইতে পারে এবং হইয়া আসিয়াছে, তেমনিভাবে তাঁহার অনুসরণে উম্মতি নবীও হইতে পারেন। আখেরী নবী বলিতে ইহাই বুঝায় যে, কোন এমন নবী তাঁহার (সাঃ) পর আসিবেন না, যিনি তাঁহার শরীয়তকে মনসুখ বা রহিত করিবে অথবা তাঁহার অনুসরন ও গোলামী ব্যাতিরেকে সতন্ত্র সত্বা হিসাবে নবী হইবে। (এই ব্যাখ্যা উম্মতের সকল সর্বমান্য শীর্ষস্থানীয় ইমামগণ সর্বকালে ও সর্বস্থানে করিয়া আসিয়াছেন)। দ্বিতীয়তঃ হযরত নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, "আমি সেই সময়েই খাতামান নবীয়ীন ছিলাম, যখন আদম সৃষ্টি হওয়ার জন্য কার্দম ও পানির মধ্যে রাখা ছিল।" এতদ্বারা নবী করীম (সাঃ) প্রথম নবী রূপেও সাব্যস্ত হইলেন। সেই জন্য তিনি আখেরী নবী এই অর্থে হইতে পারেন যে, তাঁহার শরীয়ত আখেরী। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলিয়াছেন قولوا خاتم النبيين و لا تقولوا لا نبى بعده (অর্থাৎ, তোমরা ইহা বলিবে যে, তিনি খাতামান নবীয়িন কিন্তু ইহা বলিবে না যে, তাঁহার পর কোন নবী নাই।") ইহার অর্থ এই নয় যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর কথাকে রদ করিয়াছেন,

বরং "লা নাবীয়া বা'দাহু" বলিতে এ জন্য তিনি বারণ করিয়াছেন যে, মানুষ ইহা হইতে ভুল অর্থ লইবে। যেমন, হযরত নবী করীম (সাঃ) একদা বলিয়াছিলেন من قال لا اله الا الله دخل الجنة (অর্থাৎ, যে বলিবে লা এলাহা ইল্লাল্লাহু, সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে") এবং তিনি (সাঃ) হযরত বেলাল (রাঃ)-কে ইহার ঘোষণা করার জন্যও আদেশ দিলেন। কিন্তু হযরত উমর (রাঃ) তাহাকে ইহা হইতে নিষেধ করিলেন এবং হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট নিবেদন করিলেন যে, মানুষ এই কথা হইতে ভুল অর্থ গ্রহণ করিয়া আমল ছাড়িয়া দিবে। এই কথার উপর হযরত রাসুল করীম (সাঃ)ও উহার প্রচার ও ঘোষণা নিষেধ করিয়া দিলেন।

হযরত নবী করীম (সাঃ) নিজেও বলিয়াছেন যে, لو عاش ابراهيم لكان صديقا نبيا (অর্থাৎ, যদি সাহেবজাদা ইব্রাহীম জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি সিদ্দিক হইয়া নবী হইতেন।) ইহা স্পষ্ট যে, হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর পুত্র ইব্রাহীম জোর পূর্বক নবী হইতে পারিতেন না, এবং পাছে তিনি নবী বনিয়া যান তাহা রোধ করিবার জন্য আল্লাহ্তায়ালা তাঁহাকে শৈশবেই মৃত্যু দানে বাধ্য হন, এমন ধারনা আল্লাহ্র প্রতি পোষণ করা নিতান্ত ভুল। সুতরাং এই হাদিসের মধ্যেও হযরত নবী আকরাম (সাঃ)-এর আনুগত্য এবং কুরআনের শরীয়তের অধীনে নবী হইবার ইঙ্গিত দান করা হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে হযরত নবী করীম (সাঃ) আখেরী শরীয়তের বাহক হওয়ার কারণেই আখেরী নবী এবং তিনি আওয়াল বা সর্বপ্রথমও এই হিসাবে যে, তিনি আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্য সর্বাপেক্ষা অধিক লাভ করিয়াছিলেন এবং নৈকট্যের সর্বোচ্চ মোকাম ও মর্যাদায় উন্নীত হইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি মে'রাজের মধ্যে নিজেকে 'সিদরাতুল মুনতাহা' মোকামে উপনীত দেখিয়াছিলেন, যাহা বান্দার জন্য অধ্যাত্মিক উন্নতির আখেরী মোকাম বা মর্যাদা, খোদাতায়ালার সর্বাপেক্ষা নিকটতম মর্যাদা। অন্য কথায়, আল্লাহতায়ালার দিক হইতে লক্ষ্য করিলে উহাই সর্ব প্রথম মোকাম ও মর্যাদা এবং মানুষের দিক হইতে দেখিলে উহাই সর্বশেষ ও সর্বোচ্চ মোকাম, যেখানে আমাদের প্রভু ও নেতা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) অধিষ্ঠিত আছেন।

হাদিস শরীফ

উত্তম চরিত্র

(১) হযরত আনাস বলেন যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ) মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন।

(মুস্লিম)

(২) হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ) নিজেও সীমা অতিক্রমকারী ছিলেন না এবং অন্যকেও সীমা অতিক্রম করিতে পছন্দ করিতেন না। তিনি বলিতেন. "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম, যে বেশী চরিত্রবান।"

(বোখারী)

(৩) হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, "মোমেনগণের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা পূর্ণ ঈমানের অধিকারী যে, সর্বাপেক্ষা চরিত্রবান এবং তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা চরিত্রবান সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে তাহার স্ত্রীর সহিত সর্বাপেক্ষা ভাল ব্যবহার করে"

(তিরমিযী)

(৪) হযরত মায়ায (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, যেখানেই বা যে ক্ষেত্রেই তোমরা থাক, সেখানে বা সেই ক্ষেত্রেই তোমরা আল্লাহ্র তকুয়া (অর্থাৎ তাঁহার অসন্তুষ্টির ভয়) পোষণ কর। যদি কোন পাপ করিয়া বস, তাহা হইলে উহার পরেই নেক কাজ সম্পাদনের চেষ্টা কর, এই পুণ্য সেই পাপকে মিটাইয়া দিবে। আর মানুষের প্রতি সৎ চরিত্রতা এবং সদব্যবহার প্রদর্শন কর।"

(তিরমিযী)

(৫) হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, "কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিগণই আমার নিকট সব চাইতে প্রিয় হইবে, যাহারা সব চাইতে উত্তম চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী হইবে এবং সেই ব্যক্তিগণ সব চাইতে বেশী অপ্রিয় হইবে, যাহারা মুখ ফুলাইয়া বেশী বেশী কথা বলে এবং অহঙ্কারী হয়।

(৬) হযরত আবু যর (রাঃ) হইতে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, আমার উম্মতের ভাল ও মন্দ কাজ আমার সম্মুখে পেশ করা হইল। আমি তাহাদের নেক কাজের মধ্যে পথ হইতে কষ্টদায়ক বস্তু সরাইয়া দেওয়াও দেখিতে পাইলাম এবং তাহাদের মন্দ কাজের তালিকায় মসজিদ অথবা সর্ব সাধারণের ব্যবহারের জায়গায় নাক ঝাড়া বা থুথু ফেলা, অতঃপর উহা পরিস্কার না করা বা মাটি ফেলিয়া উহাকে ঢাকিয়া না দেওয়াও রহিয়াছে।" (মুস্লিম)

অনুবাদ :— মৌঃ আহ্মদ সাদেক মাহ্মুদ

হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর

অমৃত বানী

o নবীর সাহচর্যে জীবন যাপনের অলৌকিক ফল

o সাধু-সঙ্গ লাভ করার আবশ্যকতা o আহমদীয়া সেলসেলা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য

আন্যায়কে লক্ষ্য করিয়া ত'হা বোধ করিবার জন্য তৎপ্রতি প্রয়োজনীয় সদুপদেশের তীর নিক্ষেপ করা এবং বিকৃত নৈতিকতাকে স্থানচ্যুত অঙ্গের অবস্থায় পাইয়া উহাকে যথাকারে স্বস্থানে স্থাপনের চিকিৎসা রোগীর সাক্ষাতে হওয়াই সমীচীন এবং অন্য কোন পন্থায় যথাবিহিত ভাবে হওয়া সম্ভবপর নহে। তাই খোদাতায়ালা কয়েক সহস্র নবী ও রসুল প্রেরণ করেন এবং তাহাদের সাহচর্য লাভ করিতে আদেশ দেন, যেন প্রত্যেক যুগের লোক চাক্ষুষ অদর্শ পাইয়া এবং তাঁহাদের সত্বাকে মূর্ত ঐশীবাণীরূপে দেখিতে পাইয়া তাঁহাদের অনুসরণ করিতে যত্নবান হয়। যদি সাধু-সঙ্গ লাভ করা আবশ্যকীয় বিষয় সমূহের অন্তর্গত না হইত, তবে খোদাতায়ালা রসুল ও নবীগণকে না পাঠাইয়া, অন্য কোন উপায়েও তাঁহার বাণী অবতীর্ণ করিতে পারিতেন; কিম্বা কেবল প্রাথমিক যুগেই রসুল-প্রেরণ কার্য সীমবদ্ধ রাখিতেন এবং ভবিষ্যতে চিরকালের জন্য নবী, রসুল এবং ওহি প্রেরণ কার্য বন্ধ করিয়া দিতেন। কিন্তু খোদাতায়ালার গভীর প্রজ্ঞা ও জ্ঞান তাহা কখনো মঞ্জুর করে নাই এবং প্রয়োজন মতে অর্থাৎ যখনই ঐশী-প্রেম, ঐশী উপসনা, ধর্মপরায়ণতা ও পবিত্রতা ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় বিষয় জগতে হ্রাস পাইয়াছে, তখনই পবিত্র পুরুষগণ খোদাতায়ালা হইতে বাণী প্রাপ্ত হইয়া আদর্শ-রূপে জগতে অবির্ভূত হইয়া আসিতেছেন। এই দুইটি বিষয় পরস্পরের সহিত অভিচ্ছেদ্য ভাবে সংবদ্ধ। যদি সৃষ্টি-জীবের সংস্কারের প্রতি সর্বদাই খোদাতায়ালার দৃষ্টি থাকিয়া থাকে, তবে সর্বদাই এরূপ লোকেরআবির্ভাব হওয়াও একান্ত আবশ্যক, যাঁহাদিগকে খোদাতায়ালা আপন বিশেষ ইচ্ছায় আধ্যাত্মিক দৃষ্টি প্রদান করেন এবং স্বীয় অভিষ্ট পথে অবিচলিত রাখেন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, ইহা এক সুনিশ্চিত ও সর্ববাদী সম্মত বিষয় যে এই সুমহান কার্য, জগদ্বাসীর সংস্কার সাধন, কেবল কাগজের ঘোড়া দৌড়াইয়া সাধিত হইতে পারে না। এই কার্য সধনের জন্য সেই পথেই পদ-বিক্ষেপ করা আবশ্যক, যে-পথে প্রাচীন কাল হইতে খোদাতায়ালার পবিত্র নবীগণ পদ-বিক্ষেপ করিয়া আসিয়াছেন। ইসলাম প্রারম্ভ হইতেই এই কার্যকরী ও ফলপ্রদ

পন্থাকে এরূপ দৃঢ়তা সহকারে প্রচলন করিয়াছে যে, ইহার দৃষ্টান্ত অন্য কোন ধর্মে পাওয়া যায় না। অন্যত্র কে এরূপ সুবৃহৎ জামাতের অস্তিত্ব দেখাইতে পারে, যাহা সংখ্যায় দশ সহস্র হইতেও বাড়িয়া গিয়াছিল এবং পূর্ণ অনুগত্য, বিনয়, আত্মত্যাগ সহকারে একেবারে আত্মভোলা হইয়া সত্য লাভ করিবার ও সত্যবাদীতা শিক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে নবীর দ্বারে দিবা-রাত্র পড়িয়া থাকিত? অবশ্য হযরত মুসা (আঃ)-এর জামাত শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন: কিন্তু তাহারা যে কি প্রকার ও কত খানি উদ্ধত ও আবধ্য ছিল এবং আধ্যাত্মিক সাহচর্য ও নিষ্ঠা হইতে বঞ্চিত ও বিবর্জিত ছিল, তাহা বাইবেল ও ইহুদীদের ইতিহাস হইতে পাঠকগণ উত্তমরূপে অবগত আছেন। কিন্তু আঁ-হযরত (সাঃ) এর শিষ্যমণ্ডলী আপন রাসুল-মকবুলের অনুসরণে এরূপ ঐক্য ও অধ্যাত্মিক নৈকট্য অর্জন করিয়াছিলেন যে, ইসলামী ভ্রাতৃত্বের দিক দিয়া সত্য সত্যই তাঁহারা একাঙ্গ স্বরূপ হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদের দৈনন্দিন আচার-ব্যবহার ও কার্যকলাপে এবং তাঁহাদের অন্তর ও বাহিরে নবীর জ্যোতি এরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, তাঁহারা সকলেই যেন আঁ-হযরত (সাঃ) এর প্রতিচ্ছবি ছিলেন। সুতরাং আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের এই মহা মোজেযা, যাহার ফলে উদ্ভট পৌত্তলিকগণ পূর্ণভাবে এক আল্লাহ্‌র উপাসকে পরিণত হইয়াছিল এবং নিয়ত সংসার পূজায় নিমজ্জিত ব্যক্তিগণ প্রকৃত প্রেমাস্পদ খোদার সহিত এরূপ সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিল যে, তাঁহার পথে জলের ন্যায় নিজেদের রক্ত প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিল, ইহা প্রকৃতপক্ষে এক সত্য ও কামেল নবীর সাহচর্যে নিষ্ঠার সহিত জীবন যাপন করিবার ফল। সুতরাং এই ভিত্তির উপরেই এই সিলসিলাকে কায়েম রাখিবার জন্য, এই অধম প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছে এবং তাঁহার আকাঙ্খা যে, সহচরগণের মণ্ডলী আরো অধিক প্রসারিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক এবং যাঁহারা ঈমান, প্রেম ও নিশ্চিত জ্ঞান বৃদ্ধি করিবার আগ্রহ রাখেন, তাঁহারা যেন দিবা-রাত্রি সাহচর্যে থাকিতে পারেন এবং সেই জ্যোতি দর্শন করিতে পারেন, যাহা এই অধম দর্শন করিয়াছে এবং তাঁহারা ইসলাম প্রচারের জন্য সেই আগ্রহ ও উৎসাহ লাভ করিতে পারেন, যাহা এই অধম লাভ করিয়াছে, যেন ইসলামের আলো দুনিয়াতে সর্বসাধারণের মধ্যে বিকীর্ণ হইতে পারে এবং মুসলমানদের ললাট হইতে ঘৃনা ও অপমানের কালিমা বিধৌত হইয়া যাইতে পারে। এই সুসংবাদ দিয়াই মহামহিমাময় খোদা আমাকে প্রেরণ কয়িয়াছেন এবং বলিয়াছেন :—

"ধীরে ধীরে চল, তোমার সময় সন্নিকট; মুসলমানদের পদ উচ্চতর মিনারের উপর সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।"

(ফাতাহ্-ইসলাম পৃঃ ২৪—৩৬)

জুমার খোৎবা

হযরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)

(৩১ শে জানুয়ারী, ১৯৭৫ সালে রবওয়ার মসজিদে আকসায় প্রদত্ত)

আহমদীয়া জমাত এই পাকা আকিদার উপর প্রতিষ্ঠিত যে আমাদের রাসুল মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে অসাল্লাম জীবন্ত নবী।

আল্লাহতায়ালার ভালবাসা লাভ করিবার জন্য আবশ্যক যে, তাঁহার মহান আদর্শের পূর্ণ অনুসরণ করা। তাঁহার অস্তিত্ব এই পৃথিবীর জন্য পূর্ণ রহমত স্বরূপ। এই কারণে আমাদের রসনায় দরূদ জারী থাকা আবশ্যক।

তাশাহুদ, তায়াওউজ ও সুরা ফাতেহা পাঠ করিবার পর হুযুর বলেন :—

যে ভাবে খোদাতায়ালা কোরআন করীমে বলিয়াছেন, হযরত নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হে অসাল্লাম "রহমতুল্লিল আলামীন"—বিশ্বের জন্য রহমত স্বরূপ, সেই জন্য আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহ লাভ করিবার একই উপায়, এবং তাহা এই যে, মানুষ মোহাম্মাদ (সাঃ)-কে ভালবাসিবে, তাঁহার পূর্ণ অনুসরণ করিবে এবং তাঁহার পবিত্র আদর্শ নিজের জীবনে রূপায়িত করিবে।

হযরত মসিহে মওউদ (আঃ) বলিয়াছেন যে, অনর্থক সেই জীবন, যাহা কল্যাণকর নহে, এবং অকর্মন্য সেই জীবন, যাহা কল্যণ বর্ষী ও দানশীল নহে। প্রকৃত পক্ষে এই বিশ্বে দুইটি জীবনই প্রশংসার উপযুক্ত। এক 'আল-হাই' বা চিরঞ্জীব আল্লাহর জীবন, যিনি যাবতীয় কল্যাণের উৎস, যাঁহার দিকে সমস্ত প্রশংসা প্রত্যাবর্তন করে এবং যাঁহার কল্যাণে প্রত্যেক বস্তু টিকিয়া রহিয়াছে। আর দ্বিতীয়তঃ প্রশংসার উপযুক্ত জীবন হইল হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর কল্যাণেই মানুষ নিজ 'রব'কে তাঁহার যাবতীয় মাহাত্য সহকারে, তাঁহার যাবতীয় সৌন্দর্য ও কল্যাণ সহকারে, চিনিয়াছে। হযরত নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার সারা জীবন কোরআন করীমের হেদায়েত এবং শরীয়াতের উপর আমল করিয়া আমাদিগকে আল্লাহতায়ালার পূর্ণ পরিচয় ও জ্ঞান দান করিয়াছেন।

আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন যে, "যদি মোহাম্মাদ (সাঃ)-কে সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য না হইত, তাহা হইলে এই বিশ্বই সৃষ্টি হইত না।" ইহা দ্বারা আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারি যে, নবীয়ে আকরাম (সাঃ)-এর জীবন পূর্বাপর সকলের জন্যই কল্যাণকর। আঁ-হযরত

(সাঃ)-এর রহমত পৃথিবীকে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। তাঁহার রহমতের কোন সীমা পরিসীমা নাই, ইহা কোন স্থানে সীমিত নয়, বরং কাল ও স্থান হিসাবে মৌলিক উপাদাণ ও লক্ষ্য হওয়ার কারণে পূর্ববর্তীগণের উপরেও তাঁহারই কল্যাণে ফায়েজ অবতীর্ণ হইয়াছে এবং পরবর্তীগণও যাহা পাইয়াছেন, তাহাও তাঁহারই কল্যাণে লাভ করিয়াছেন। কারণ যদি তাঁহার সম্পর্কেই ইহা বলা যথাযত, এবং নিশ্চয়ই যথাযত হইয়াছে যে, "লওলাকা লামা খালাক তুল আফলাকা' তাহা হইলে আধ্যাত্মিক ভাবে যে, সকল কল্যাণ দৃশ্য হয় তাহা তাঁহারই কল্যাণে লাভ হইয়া আসিয়াছে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে লাভ হইতে পারে না। দ্বিতীয় ইহল জাগতিক কল্যাণ প্রবাহ। যেহেতু তাঁহার কারণে এই বিশ্ব খোদাতায়ালার রবুবিয়াত এবং রহমানিয়তের প্রকাশও দেখিয়াছে, সেই জন্য ঐ সকল কল্যাণ প্রত্যেক সৃষ্টিই লাভ করে; উহাদের বৃত্ত প্রত্যেক প্রাণী এবং প্রত্যেক মানব পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু আধ্যাত্মিক কল্যাণ তাঁহার অনুসরণ কারীদের উপরেই অবতীর্ণ হয়। তেমনি ভাবে যাহা জ্ঞান বিষয়ক কল্যাণ উহাও প্রত্যেকা মানুষের উপর বর্ষিত হইয়া থাকে। তিনি যে শিক্ষ আনয়ন করিয়াছিলেন উহাতেও সব মানুষ শামিল রহিয়াছে, সকলেই উহার লক্ষ্য-স্থল, কারণ তাঁহার মধ্যে কোন কৃপণতা নাই, আর সেই শিক্ষার মধ্যেও কোন কৃপনতা থাকিতে পারে না, যাহা তাঁহার উপর অবতীর্ণ হইয়াছে। সুতরাং দেখুন, জীবনে তাঁহাকে অনেক যুদ্ধ করিতে হইয়াছে, বিরুদ্ধবাদীগণ তাঁহাকে অনেক কষ্ট দিয়াছে, তাঁহার অনুবর্তীগণকে শহীদ করিয়াছে, অর্থ হরণ করিয়াছে, কিন্তু সেই সময়েও যেখানেই কোন দুঃখ ও কষ্ট দেখিয়াছেন, তিনি এবং তাঁহার সহচরগণ তাহা দূর করিবার চরম প্রচেষ্টা চালাইয়াছেন। যেখানেই মানুষকে জীবন-মৃত্যুর সমস্যায় লিপ্ত দেখিতে পাইয়াছেন, সেখানেই পার্থিব ভাবে এবং আধ্যাত্মিক ভাবেও বাঁচার উপকরণ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এবং যেখানেই অজ্ঞতার অন্ধকার দেখিতে পাইয়াছেন, সেখানে সেইসব অন্ধকারকে আলোতে পরিবর্তন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

সুতরাং স্পেনে যখন মুসলমানগণ গিয়াছেন, তখন তাঁহারা নিপিড়ীত মানবতার সাহায্য করিবার জন্যই গিয়াছিলেন। তৎপর আল্লাহ্-তায়ালা অনুগ্রহ করেন, ফলে সেই এলাকায় আল্লাহতায়ালা এবং হযরত

মোহাম্মদ (সাঃ)-এর আলো

বিস্তার লাভ করে। এই আলো দুইভাবে প্রকাশ্য রূপে আমরা দেখিতে পাইতেছি। এক ত জ্ঞানের ক্ষেত্রে এবং দ্বিতীয়, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে। স্পেনে মুসলমানগণ যে ক্ষেত্রে বিরাট উন্নতি করিয়াছে, তাহা আঁ-হযরত (সাঃ) এর কল্যাণে এবং তাঁহার চিরস্থায়ী

হায়াতের কারণেই করিয়া ছিল, যাহা পরবর্তীগণ আঁ-হযরত (সাঃ)-এর আধ্যাত্মিক দানশীলতায় লাভ করিয়াছিল, যাহার মোকাবেলা তখনকার দুনিয়া বিশেষতঃ 'খ্রীষ্টান দুনিয়া' করিতে পারে নাই, কারণ ইহা ছিল সেই মোকাবেলা, যাহা আলো এবং অন্ধকারের মধ্যে হইতে পারে। মুসলমানগণ পার্থিব জ্ঞান বিস্তারের জন্য বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বহু বিশ্ববিদ্যালয় কায়েম করিয়াছিলেন, যেখানে অনেক বড় বড় পাদ্রী ভর্তী হইতেন এবং প্রচলিত জ্ঞান-বিদ্যার শিক্ষা লাভ করিতেন। সুতরাং মুসলমানগণ কোন কৃপনতা করেন নাই। কারণ কৃপনতা খোদাতায়ালার দিকে আরোপ করা চলেনা, হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাহে অসাল্লামের দিকেও আরোপ করা যায় না, কারণ তিনি "রহমতুল্লিল আলামীন" অর্থাৎ বিশ্বের জন্য আশীর্বাদ হইয়া আগমন করিয়াছেন। তাঁহার সহচরগণও তাঁহার রঙ্গে রঙ্গীন ছিলেন। এই জন্যই কৃপনতা সেই মোমেন গণের দিকেও আরোপ করা যায় না, যাঁহারা আঁ-হযরত (সাঃ) এর পবিত্র আদর্শকে অনুসরণ করিয়া ছিলেন এবং মূর্ত্তিমান কল্যাণ হইয়া এমন সহানুভূতির সহিত পৃথিবীর সেবা করিয়াছেন, যাহার দৃশ্য মানব দৃষ্টি কোন কালে এবং কোন জাতির মধ্যে দেখিতে পায় নাই। আফ্রিকা, যেখানে আজকাল অবনতির যুগ, এবং অনেকেই আবার ইসলাম ধর্ম ত্যাগও করিয়াছে এবং আজ উহা অন্ধকারের এলাকায় পরিণত হইয়াছে, সেখানে সেই কালেও যখন রাস্তা ঘাট প্রায় বন্ধ ছিল, তখন মানব জাতিকে একই ধর্মে একত্রিত করিবার জন্য হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পবিত্র আদর্শ সামনে রাখিয়া মুসলমানগণ দূর দূরান্তে পৌঁছিয়া গিয়াছিলেন, এবং তাঁহারা আফ্রিকার অধিবাসীদের অন্ধকার দূরিভূত করিয়াছিলেন, তাহাদের উন্নতির উপকরণ সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং তাহাদের দুঃখকে সুখে পরিণত করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে ধর্মের জ্ঞান ও পার্থিব জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং খোদাতায়ালার সহিত তাহাদের এক জীবন্ত সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন, যাহা মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় কল্যাণ।

অতএব আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাহে অসাল্লামের পবিত্র জীবন সব দিক দিয়া এবং সর্ব প্রকারে উপকারী এবং কল্যাণবর্ষী জীবন। তাঁহার এই দানশীলতা এবং কল্যাণ প্রবাহ চিরস্থায়ী অধ্যাত্মিক জীবন, যাহার ফলে গত চৌদ্দ শত বৎসর লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ তাঁহার আত্মিক কল্যাণে ভূষিত হইয়া আপন স্রষ্টা সর্বপ্রদাতা আল্লাহ্‌র সঙ্গে এক জীবন্ত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তাঁহার ভালবাসা লাভ করিয়াছে। এই দ্বার আজও বন্ধ হয় নাই। কেয়ামত পর্যন্ত কখনও বন্ধ হইবে না।

"কুল ইনকুনতুম তুহিববুনা-ল্লাহা ফাততা বেউনি ইউহ-বিবকুমুল্লাহু" (আলেইমরান : ৩২)— আয়াত অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তি যে হযরত নবীয়ে আকরাম (সাঃ)-এর সত্যিকার অনু-

সরণের মাধ্যমে আল্লাহ্‌তায়ালার ভালবাসা অন্বেষণ করিবে, সেই ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার ভালবাসা লাভ করিতে পারিবে এবং তাহার জীবন অন্ধকার হইতে বাহির হইয়া আল্লাহতায়ালার আলোতে প্রবেশ করিবে। তাহার জীবন এক আলোকিত জীবন, এক আনন্দময় জীবন, এক পরিপূর্ণ জীবন এবং এক কল্যাণকর জীবনে পরিণত হইবে। উম্মতে মোহাম্মাদীয়ায় এমন লোকও পাওয়া যায় যাহারা মনে করে আঁ-হযরত (সাঃ) কে আল্লাহতায়ালার পক্ষ হইতে চিরস্থায়ী জীবন দান করা হয় নাই, এবং তাঁহার দ্বারা কল্যাণ ও আশিস এবং অনুগ্রহ লাভ করা যাইবে না। আহমদীয়া জমাত এইরূপ বিশ্বাস করে না। জমাতে আহমদীয়া ত এই দৃঢ় বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত যে, আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ) এক জীবন্ত নবী। তাঁহার জীবনের প্রমাণ এই যে, দুনিয়ার দৃষ্টিতে বিতাড়িত এই জামাতে হাজার হাজার এই রূপ খোদার বান্দা সৃষ্টি হইয়াছেন, এখনও আছেন, ভবিষ্যতেও পয়দা হইতে থাকিবেন, যাঁহারা আঁ-হযরত (সাঃ) এর নিকট হইতে ফয়েয এবং আশিস লাভ করিয়া আসিতেছেন এবং যাঁহাদের জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন সাধিত হইয়া আসিয়াছে এবং হইতে থাকিবে। অন্যদের মধ্যে যে নির্জীব ভাব পরিলক্ষিত হয়, উহা হইতে তাঁহারা মুক্তি লাভ করিয়াছেন। আমরা এমন এক জীবন লাভ করিয়াছি, যাহা বাস্তব জীবন, অর্থাৎ সেই জীবন, যাহা খোদাতায়ালার ভালবাসা এবং জীবন্ত সম্পর্ক পয়দা করিবার পর মানুষ লাভ করে।

সুতরাং এই ভালবাসা এবং জীবন্ত সম্পর্ক প্রাপ্ত হইবার পর, খোদাতায়ালার ভালবাসা লাভ হইবার পর, খোদাতালার সত্তা ও গুণাবলীর জ্ঞান লাভ করিবার পর, হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর মাহাত্য এবং মর্যাদা চিনিবার পর এবং সেই মাহাত্য, সৌন্দর্য এবং কল্যাণের দ্বারা কার্যতঃ স্বীয় জীবনে এক পরিবর্তন অনুভব করার পর, মানুষ একদিকে নিজ খোদার স্মরণে নিমজ্জিত থাকে, অপর দিকে তাহার রসনায় আঁ-হযরত (সাঃ)-এর প্রতি দরূদ জারী থাকে। এমতাবস্থায় সে দুনিয়া এবং দুনিয়া-দার ব্যক্তি-দিগের কোন গ্রাহ্য করে না।

যদি আমরা এই বিশ্ব সম্পর্কে চিন্তা করি, তাহা হইলে আমরা জানিতে পারিব যে, প্রকৃত পক্ষে মাত্র দুইটি জীবনই দৃষ্টি-গোচর হয়; এক হইল আল্লাহতায়ালার অস্তিত্ব, যিনি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং উহার সব বস্তুর মধ্যে অগণিত গুণ সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুকেই মানুষের সেবকরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই খোদা, আমাদের প্রিয় আল্লাহ, যিনি মানুষকে ব্যক্তিগত ভাবেও এবং সমষ্টিগত হিসাবেও এমন শক্তি প্রদান করিয়াছেন, যে খোদাতায়ালার সৃষ্ট এই সকল খেদমতগারের নিকট হইতে খেদমত গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়। তিনি সেই শক্তিশালী অস্তিত্ব, যিনি আঁ-হযরত (সাঃ-কে অতুলনীয় রসুল এবং আল্লাহতায়ালার

গুণাবলীর পূর্ণ বিকাশস্থল রূপে আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহার আদর্শের উপর চলিয়া এবং তাঁহার জীবন পাঠ করিয়া আমরা সফলতা ও সিদ্ধি লাভ করিয়াছি। ইহা তাঁহারই মহান আদর্শ, যাহা অনুসরণের ফলে এবং যাঁহার গোলামীর ফলে তাঁহার সেবক হইয়া আমরা আমাদের প্রিয় প্রভু আল্লাহ্‌র প্রেম লাভ করিয়াছি। ইহাই প্রকৃত সফলতা, যাহার পর আমাদের আর কোন বস্তুর প্রয়োজন নাই; অন্য কোনও দিকে দৃষ্টি দিবার প্রয়োজন নাই।

অতএব এই দুইটি জীবনই প্রকৃত জীবন, যাহা মহান মর্যাদাশালী। অবশিষ্ট জীবন ইহাদেরই কল্যাণে অবস্থিত। আল্লাহতায়ালার জীবন সকল জীবনের উৎস; আর হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবন, আল্লাহতায়ালার জ্ঞান লাভ করিবার উপায়। তাঁহার অস্তিত্ব এই বিশ্বের জন্য পূর্ণ রহমত। ইহা আঁ-হযরত (সাঃ)-এরই কামালিয়ত যে তাঁহার মাধ্যমে মানুষের জন্য এইরূপ উপকরণ সৃষ্টি করা হইয়াছে যে সে সাধনার দ্বারা খোদাতায়ালার তত্ত্বজ্ঞান ও প্রেম লাভ করিবার মর্যাদালাভ করিতে সমর্থ হয়। এই জন্য আমাদের রসনায় সব সময় খোদাতায়ালার প্রশংসার গীত জারী থাকা প্রয়োজন। তেমনি ভাবে আমাদের রসনায় সব সময় দরূদ জারি থাকা চাই। মানবতার কল্যাণকারী রসুল হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জন্য দোয়া করা কর্তব্য। তিনি যে মানব জাতিকে ভালবাসিয়াছেন উহা জীবন্ত ও চিরস্থায়ী করিয়া রাখার জন্য সর্বদা প্রচেষ্টা জারি রাখা কর্তব্য, যেন সেই ভালবাসার ফলশ্রুতি হিসাবে, যাহা আমাদের অন্তরে আঁ-হতরত (সাঃ)-এর জন্য উদ্বেল রহিয়াছে, আল্লাহতায়ালার ভালবাসাও লাভ করিতে পারি। খোদা করুন, আমরা সবাই যেন উহা লাভ করিতে পারি।

জুমার খোৎবা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় কথা যাহা আমি বলিতে চাই, উহা জলসা সালানা সম্পর্কে আমি এই সম্পর্কে দুইটি কথা বলিতে চাই। এক ত এই যে, এই জাতির উপর জুলুম হইয়াছে, ভাইয়ে ভাইয়ে এবং মানুষে মানুষে ঘৃণার সৃষ্টি করানো হইয়াছে, এই কারণে সম্ভবতঃ আমরা যদি (জলসার সময়ে) রুটি তৈয়ার করার পুরাপুরি লোক না পাই, যদিও ইহা অকাট্য নহে; কিন্তু দুনিয়ার কোন জিনিসই এমনভাবে আমাদের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারে না, যে আমরা অকৃতকার্যতায় পর্যবসিত হই। প্রথমতঃ এই জমাত খুবই প্রিয় জমাত; দুই তিন বৎসর হইল জলসার সময় 'নান বাই' (রুটি প্রস্তুত কারক)-দের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়া গিয়াছিল, এবং উহার

ফলে রুটীতে কিছু অভাব ঘটিয়াছিল, তখন সকাল বেলা ; নামাযের পূর্বে আমাকে সংবাদ দেওয়া হইল। আমি সকালের নামাযের সময় ঘোষণা করিলাম, আজ প্রত্যেক ব্যক্তি, সে মেহমান হউক, অথবা স্থানিয় হউক, একটি করিয়া রুটী খাইবে। আমিও আমাদের ঘরে এই ব্যবস্থা করিলাম। ইহাতে আমাদের কোন কষ্ট হয় নাই, একটি করিয়া রুটী খাইয়াছি। বরং কোন কোন বন্ধু আমাকে বলিয়াছেন, অনেকে এমনও আছেন যাহারা বলিয়াছেন, 'ইহাতে কি পার্থক্য আছে? আমরা সারা জলসাই একটি রুটী ব্যাবহার করিব। ঠিক আছে, এমন কোন কষ্ট হইবে না।' হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) প্রথমে

একাদিক্রমে রোযা রাখিয়াছেন।

তখন তিনি বলিয়াছেন, চল, ইহাও পরীক্ষা করিয়া দেখি যে, কম পক্ষে কত খানি কম আহারে স্বাস্থ্য সহকারে জীবন ধারন করা যাইতে পারে? তারপর তিনি স্বল্পাহার করিতে লাগিলেন, এমন কি মাত্র একটি রুটী আহার করিতে লাগিলেন, অথবা অর্দ্ধেক রুটীর চেয়ে কিঞ্চিৎ বেশী পরিমানে আহার করিতেন। কোন কোন সময় রুগ্নাবস্থায় (সব সময় নহে), আমার কখনও কখনও রক্তে সুগার বেশী হইয়া যায়। কিছু দিন আগে আমাদের ঘরে যে পাতলা ফুলকা পাক করা হয়, উহার অর্দ্ধেক আমি খাইতাম আমি আন্দাজ করিয়াছি, চব্বিশ ঘন্টায় আমার আটার খোরাক সোয়া ছটাক পরিমান হইবে। ইহাতে আমি খুব ঠিক ছিলাম। অজানা ভাবে কিছু দুর্বলতা আসিয়া যাইত। কিন্তু খোদাতালা অনুগ্রহ করিয়াছেন ; প্রকৃত পক্ষে আল্লাহতায়ালাই অনুগ্রহশীল। আজ আমি বলিতেছি, আমার সুগার যথেষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছিল এবং ২৩০ পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। আমি এলোপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করি নাই এবং গতকাল চারি সপ্তাহ পর টেষ্ট লওয়া হইয়াছে, উহাতে ২৩০ হইতে কম হইয়া ১৬০-এ আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আলহামদুলিল্লাহ। এখনও অল্প কিছু বেশী আছে, আমার মনে হয়, এক দুই সপ্তাহে এলোপ্যথিক ঔষধ ব্যতিরেকে এই ভাবেই খাওয়ার দিক দিয়া বাধা নিষেধ মানিয়া চলিলেই ঠিক হইয়া যাইবে।

আমি বলিতেছিলাম যে, হযরত মসিহে মওউদ (আঃ)-এর লঙ্গরখানার ব্যবস্থার মধ্যে

জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে

চাউল বেশী করিয়া কিনিয়া রাখা উচিৎ, কারণ উহা শীঘ্রই পাক হইয়া যাইবে। দ্বিতীয় কথা এই যে, এ বৎসর কোন মেহমানই আপত্তি করিবে না, যদি আপনারা বাঁশমতি চাউলের পরিবর্তে মোটা চাউল পরিবেশন করেন। কারণ মুল্য অনেক বেশী হইয়া গিয়াছে। এই দিকে মনযোগ দেওয়া উচিৎ, এবং খাদ্যের ব্যাপারে রুটী তৈয়ার করিবার জন্য রাবওয়ার সব ঘরকেই প্রস্তুত থাকিতে হইবে। রাবওয়াতে এক

হাজার ও দুই হাজারের মধ্যে চুলা জ্বলিয়া থাকে, যদি আবশ্যক হয়, খোদা করুন যেন কোন আবশ্যক না হয়, কিন্তু

যদি আবশ্যক হয়

তাহা হইলে প্রত্যেক ঘরকেই এক শত করিয়া রুটী পাকাইয়া দিতে হইবে। ইহার ফলে এক হাজার ঘর হইতে আমরা এক লক্ষ রুটী পাইব এবং প্রত্যেক ব্যক্তিই এক একটি করিয়া রুটী পাইবে। এই ভাবে আমাদের হিসাবও ঠিক হইয়া যাইবে। আর কিছু ভাতের ব্যবস্থা হইয়া যাইবে। দ্বিতীয়তঃ রাবওয়ার বাহির হইতে যেসকল আহ্‌মদী গ্রাম হইতে আসিবেন, তাহাদের পুরুষ ও মহিলা-দিগকে আটারগুলী বানাইয়া রুটী প্রস্তুত কারী মিশিনে ফেলার এখন হইতেই ট্রেনিং দিয়া প্রস্তুত রাখিবে। পুরুষগণও সঙ্গে থাকিবে। এই ভাবে রুটী পাক করিবার আমাদের যে মিশিন চলিতেছে, অথবা যদি অন্য কোন ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে সেইখান হইতে আমাদেরকে রুটী সংগ্রহ করাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যাহা হউক, মেয়েদের দ্বারা রুটী পাক করাইবার ব্যবস্থা লাজনা ইমাউল্লাহ্ করিবে।

দ্বিতীয় কথা আমি এই বলিতে চাই যে, ঘটনাক্রমে আমাদের বড় ঈদ (কুরবাণীর ঈদ) ২৫শে ডিসেম্বর অথবা ২৬শে ডিসেম্বর হইবে। আমার মনে হয় ২৫ তারিখে হইবে, ইনশা-আল্লাহ্। তাহা হইলে, ২৫, ২৬ এবং ২৭ তারিখে আমাদের জমাত রাবওয়াতে এবং বাহিরে কোরবাণী দিবেন। এই সব কোরবাণীকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া উহার সব গোস্তই, সব গোস্তের অর্থ, সেই দুই অংশ ব্যতিরেকে, যাহা নিজের এবং নিকটবর্তী আত্মীয় গণের অংশ, জলসার নেজামকে দিয়া দিবেন। রাবওয়ার বাহিরে যাঁরা আছেন, তাঁহা-দের অনেকেই নিজেদের কোরবানী সমূহ পূর্বেই জমাতী ব্যবস্থানুসারে, রাবওয়াতে পাঠাইয়া থাকেন, কিন্তু প্রাইভেট ভাবে তাঁরারা কোন নাযারাত অথবা লঙ্গরখানায় প্রেরণ করিয়া থাকেন যেন তাহাদের পক্ষ হইতে কোরবানী দেওয়া হয়। অতএব যতদূর সম্ভব প্রত্যে-কেই নিজ অবস্থানুযায়ী মীমাংসা করিবে। মীমাংসা আপনারা করিবেন। যতটুকু আপনা-দের অবস্থা অনুমতি দেয়, ততটুকু

আপনারা বাহিরের লোক, রাবওয়াতে কোরবানী করাইবেন

এবং রাবওয়ার বাসিন্দাগণ যতটুকু সম্ভব বেশীর চেয়ে বেশী গোস্ত জলসার ব্যবস্থাপক দারুয যেয়াফত, অথবা হযরত মসিহে মওউদ (আঃ)-এর লঙ্গরের ব্যবস্থা জলসার সময়ে যাহাদের হাতে হইবে, তাহাদিগকে কুরবাণীর গোস্তের আংশ দিয়া দিবেন। খরচ অনেক বাড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু পার্থিব কোন খরচই আমাদের পথে প্রতিবন্ধক নহে। কিন্তু এই বৎসর অভিজ্ঞতাও হইয়া যাইবে। যে সব অভিজ্ঞতার সুযোগ পাওয়া যায়, তাহা করা দরকার। অবশেষে আমি জলসা সম্পর্কে এই বলিতে চাই, এই জলসায়

আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহে, তাঁহার বরকত এবং রহমতের ফলে আমি এই আশা রাখি যে, জলসায় আগমন-কারীগণের সংখ্যা গত বৎসরের তুলনায় অনেক বেশী হইবে, ইনশাআল্লাহ। * যাহারা রবওযায় নিজেদের গৃহ নির্মান করার কথা ছিল, তাহারা দাঙ্গা হাঙ্গামার দিনে, গৃহ নির্মান করিতে পারে নাই। প্রত্যেক বৎসরই গৃহ নির্মান হইত, এবং তাহা অনেক হইত। সেই জন্য

আমি এই তাহরীক করিতে চাই

যে, প্রত্যেকেই, যাহার নিকট জমি আছে, কিন্তু সে এখনও গৃহ নির্মান করে নাই, (সরকারের অনুমতি লইয়া) শীঘ্রই জলসার পূর্বে গৃহ নির্মান করিবে; সম্ভব হইলে দুই তিন ফুটের চারিপ্রাচিরও নির্মান করিয়া লইবে। যদি ইহা তাহার জন্য সম্ভব না হয়, তাহা হইলে এক কামরা এই উদ্দেশ্যে বানাইয়া লইবে, যে জলসার মেহমানগণ সেখানে থাকিবে। এই আন্তরিক উদ্দেশ্যে গৃহ নির্মান করিলে আল্লাহতায়ালা উহাতে অনেক বরকত দান করিবেন। অতএব আজই এই কাজ আরম্ভ করিয়া দিন। আজকের অর্থ এই যে, যাহার কানে যে সময় এই আহ্বান পৌছায়, সেই সময় হইতে এই কাজ আরম্ভ করিবেন। পরে যেন আপনারা নিজেরাও উহাতে বসবাস করিতে পারেন, অথবা যাহারা অর্থসম্পন্ন আছেন তাহারা নিজেদের কাজ কর্ম করিবার লোকদের জন্য যে রূপ কামরা বানান সে ভাবের কাঁচা বাড়ীই নির্মান করিয়া লইবেন, কিন্তু জলসার মেহমানদের উদ্দেশে নির্মান করিবেন; (এবং আইনের অনুমতি লইয়া নির্মান করিবেন)।

আমার এই তাহরীকের এক কারণ ইহাও যে, যে দিন জাতিয় পরিষদে সমস্ত সংসদ সদস্যের বিশেষ কমিটি বসিল, সেই দিন যখন ঘোষণা হইল যে, এই কমিটির কাজ গোপনীয় (in-camera) হইবে, এই কথা আমাকে খুবই বিচলিত করিয়া তুলিল এবং এই সংবাদ পাওয়ার পর হইতে পর দিন সকাল চারটা পর্যন্ত আমি খুবই অস্থির ছিলাম, এবং আমি খুবই দোয়া করিলাম, ইহাও দোয়া করিলাম যে, হে খোদা! গোপন পরামর্শ হইতেছে, জানি না, ইহাতে আমাদের বিরুদ্ধে কি হইতেছে? তোমার নির্দেশ এই যে, আমিও তাহাদের মোকাবেলায় যেন তদবীর করি; তোমার নির্দেশ এমাতাবস্থায় কিভাবে পালন করিব? তাহাদের গোপন পরামর্শ সম্পর্কে আমার কিছুই জানা নাই। এমতা-বস্থায় তোমার নির্দেশ পালন করিতে সমর্থ নহি। তুমি বলিয়া দাও, আমি কি করিব? সুরা ফাতেহা অনেক বার পড়িয়াছি 'এহ্‌দেনাস সেরাতাল মুস্তাকীম' অনেক বার পড়িয়াছি। এই ভাবে অনেক দোয়া করিয়াছি। এবং সকাল বেলা আল্লাহতায়ালা খুবই করুণা ভরে আমাকে এই বলিলেন:

وسع مكانك انا كفيناك المستهزئين

---

* (আল্লাহতায়ালার উক্ত শুভ সংবাদ আনু-যায়ী উল্লিখিত সালানা জলসায় দেড়লক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছিল, পূর্ববর্তী বৎসরের জলসার তুলনায় ৩০ হাজার বেশী। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র—সম্পাদক)

অর্থাৎ, "আমার মেহমানের জন্য তুমি ব্যবস্থা কর এবং নিজেদের গৃহ আমার মেহমানদের জন্য প্রশস্ত কর। আর, জমাতের বিরুদ্ধে যে সব ষড়যন্ত্র চলিতেছে, ইহার প্রতিরোধ তোমার পক্ষ হইতে আমিই করিব।" ইহাতে আমি সান্তনা পাইলাম। وسع مكانك যে বিশেষ ভাবে বলা হইয়াছে, সেই কারণে জামাতকে বলিয়া দেওয়া আমার কর্তব্য ছিল। যাহারা নিজেদের গৃহে কামরা বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছা রাখেন তাহারা কামরা বানাইবেন, এবং প্রত্যেক প্লটে জলসার মেহমানগণের বসবাসের জন্য এক কামরা বানাইয়া সাময়িক ভাবে তাহাদিগকে উপহার পেশ করুন, এবং সাময়িক উপহারের পরিবর্তে চিরস্থায়ী সওয়াব ও পুরুস্কারের ব্যবস্থা করিয়া নিন। আল্লাহতায়ালা সবাইকে নেকী করিবার শক্তিদান করুন। আমীন।

অনুবাদ: মৌঃ এ, কে, মুহিবুল্লাহ

সংবাদ

হযরত সাহেবের স্বাস্থ্য

৩০শে জুন, কাদিয়ান, সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ)-এর স্বাস্থ্য সম্পর্কে ২৩শে জুনের সংবাদে প্রকাশ যে, হুজুরের স্বাস্থ্য আল্লাহতায়ালার ফজলে ভাল। আলহামদুলিল্লাহ। ভ্রাতা-ভগ্নিগণ হুজুরের পূর্ণ স্বাস্থ্য ও সালামতী, দীর্ঘায়ু এবং ইসলামের আধ্যাত্মিক বিজয়ের ক্ষেত্রে তাঁহার সকল উদ্দেশ্য ও কর্ম-প্রচেষ্টায় পূর্ণ সফলতার লাভের জন্য দরদেদেলের সহিত দোয়া জারী রাখিবেন।

নাইজেরিয়ায় নুতন হসপাতাল প্রতিষ্ঠা

হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ) কৃর্তৃক জারী কৃতর্ক মজলিস নুসরত জাহানের পরিকল্পনাধীনে নাইজেরিয়া (আফ্রিকার)-এর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান আবাদানে একটি নুতন হাসপাতাল জারী করা হইয়াছে। এখন আল্লাহতায়ালার ফজলে জামাত আহমদীয়ার দ্বারা উক্ত এলাকায় ইহা প্রথম মুসলিম হাসপাতাল স্থাপিত হইল। নাইজেরিয়াতে মজলিস নুসরত জাহানের অধীনে ইহা হইল তৃতীয় হাসপাতাল, যাহার মধ্যে সবপ্রকার সার্জারীর ব্যবস্থাও থাকিবে।

বন্ধুগণ উক্ত হাসপাতালটির জন্য দোয়া করুন, যেন আল্লাহতায়ালা ইহাকে আধ্যাত্মিক ও দৈহিক উভয় শ্রেণীর রোগীদের মহা আরোগ্য-কেন্দ্রে পরিণত করেন। আমীন।

হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মাওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত বয়াত (দীক্ষা) গ্রহনের দশ শর্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা, পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহতায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে, বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহর সৃষ্টকান জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফায়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কোরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সল্লোমের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন প্রান, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহতায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস্‌ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ট হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। (এশতেহার তকমীলে তবলীগ, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ ইং)

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস্ সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেস্তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কোরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বেঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কোরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোজা, হজ্জ ও যাকাত এবং তাহার সহিত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং তাহা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, সে কেন আমাদের বুক চিড়িয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে অন্যরূপ এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনাল মুফতারিয়ীন"—

(অর্থাৎ—"সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ")

(আইয়ামুস সুলেহ্ পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Mollah at Ahmadiyya Art Press
for the proprietors: Bangladesh Anjuman-e-Ahmadiyya,
4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.